হযরত ইমাম হোসাইন (রাদ্বিঃ) ও কারবালা: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

ডা: এ.এন.এম.এ মোমিন

জান্নাতের যুবকদের সর্দার, মুহাম্মদুর রাসূলল্লাহ্ (দঃ) এর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র, শহীদদের নেতা ও মজলুম ইমাম হোসেন, ৪ঠা হিজরী সনে সাবান মাসের ৫ তারিখ বৃহস্পতিবার পবিত্র নগরী মদীনা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত হোসাইন (রা)'র বহুবিধ গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁকে যাকী, রাশীদ, তাইয়েব, সাইয়েদ মুবারক এবং আল্লাহর আনুগত্যকারী ইত্যাদি উপাধীতে ভূষিত করা হয়।

<u>পবিত্র কুরআনে হযরত হোসাইন (রাদ্বিঃ) এর জন্ম সম্পর্কিত আয়াত:</u>

ইবনে শাহ আশাহব আশোব তাঁর 'মানক্বিব' গ্রন্থে কিতাব আল আনওয়ার এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহতা'লা রসূল (সাঃ)কে ইমাম হোসাইন (রাদ্বিঃ) মাতৃগর্ভে আসা ও তাঁর জন্ম সম্পর্কে অভিনন্দন পাঠালেন এবং একই সাথে তাঁর শাহাদত সম্পর্কে শোকবার্তা পাঠালেন। হযরত ফাতিমা (রাদিঃ)কে তা জানানো হলো তিনি শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়:- "কষ্ট নিয়ে তাঁর মা, তাঁকে বহন করেছে এবং কষ্টের ভেতরে সে তাঁকে প্রসব করেছে এবং তাঁকে গর্ভে ধারণ ও দুধ খাওয়ানো ছিল ত্রিশ মাস।" (সূরা আহকাফ্- ১৫)। সাধারণত একজন নারীর গর্ভকাল হলো নয় মাস এবং কোন শিশু ছয় মাসে জন্মগ্রহণ করে বেঁচে থাকে না শুধুমাত্র নবী ঈসা (আঃ) এবং ইমাম হোসাইন (রাদিঃ) ছাড়া।

<u>হযরত ইমাম হোসাইন (রাদিঃ) রসূল (দঃ) এর পুত্র সন্তান হওয়া সম্পর্কে কুরআনের ঘোষনা:</u>

"আপনার কাছে এই জ্ঞান আসার পর এ নিয়ে কেউ বিতর্ক করতে এলে তাকে বলো, "এসো আমরা ডাকি আমাদের পুত্রদের ও তোমাদের পুত্রদের আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের আমাদের নিজ সত্বা (প্রাণ, নফস) ও তোমাদের নিজ সত্বাকে, অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহ্র লা'নত (অভিশাপ)।" (সূরা আল ইমরান- ৬০)

ইসলামের ইতিহাসে পবিত্র কুরআনের এই আয়াতকে আয়াতে 'মোবাহিলা' বলা হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ নজরানে খৃষ্টান পাদ্রীগণ রসূল (দঃ) ইসলামের দাওয়াত কবুল না করে তাঁর সাথে এই বলে চ্যালেঞ্জ করলো যে, রসূল (দঃ) এর পক্ষ এবং তাঁদের পক্ষের ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর কাছে পরস্পরের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট অভিসম্পাত প্রদান করবে। মিথ্যাবাদীর দল ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং সত্য বিজয়ী হবে। এ প্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয় এবং রসূল (দঃ)'র পক্ষে কারা থাকবেন সে ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদের্শনা দেওয়া হয়। আল্লাহ্ পাকের নিদের্শ অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর পুত্রগণ হিসাবে হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন (রাঃ), নারী হিসাবে মা ফাতেমা তুজ যাহারা (রাদ্বিঃ) ও রসূল (দঃ) স্বীয় সত্বা বা প্রাণ তথা নফস হিসাবে হযরত আলী (রাদ্বিঃ)কে নিয়ে নির্ধারিত স্থানে পোঁছেন। এদের চেহারা মোবারকের নূরের তাজাল্লী দেখে খৃষ্টান পাদ্রীগণ তাঁর সাথীদের জানালেন যে, তাঁরা এমন ব্যক্তিত্ব, যদি তাঁরা পাহাড়কে আদেশ করেন তবে তাও সরে যাবে। আর এদের সাথে চ্যালেঞ্জে গেলে খৃষ্টান জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। বর্ণিত ঘটনা থেকে জানা গেল যে, হোসাইন (রাদ্বিঃ) আল্লাহর নির্দেশের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর পুত্র।

<u>মহাপবিত্র ইমাম হোসাইন (রাদ্বিঃ):</u>

"হে নবী পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চাহেন তোমাদিগকে অপবিত্রতা হইতে দূর করিতে এবং তোমাদিগকে পবিত্র করিতে।" (সূরা আহযাব- ৩৩)

আলোচ্য আয়াতে নবীর 'আহলে বায়াত' বলে নবী পরিবারকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। শিয়া সুন্নী নির্বিশেষে সকল আলেম এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করেন যে, নবীর আহলে বায়াত হলেন- হযরত আলী (রাদিঃ), ফাতেমা তুজ যাহারা (রাদ্বিঃ), ইমাম হাসান (রাদ্বিঃ) ও ইমাম হোসাইন (রাদ্বিঃ)। ও তাদের বংশধরগণ তাই এটা তর্কাতীত যে, নবী পরিবারের পবিত্রতা কিয়ামত পর্যন্ত একটি স্বীকৃত ব্যাপার। তাই এই পরিবারের সদস্যগণেই প্রকৃতপক্ষে অন্যদেরকে পরিশুদ্ধতা দান করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব বা কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আর অন্যকে এই পরিশুদ্ধ করার ক্ষমতা নবী ও নবীর উত্তরাধিকারীদের জন্যই সংরক্ষিত। পবিত্র কুরআনে নবীদের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে- "অবশ্যই আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাঁদের জন্য তাঁদের (জাতির) থেকেই এক রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ আবৃত্তি (তেলওয়াত) করে শুনিয়ে থাকেন। তাঁদেরকে (আত্মাসমূহকে) পরিশুদ্ধ করে তাঁদেরকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা (হিকমত) শিক্ষা দেন এবং নিশ্চয় তাঁরা এর পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।" (সূরা আলে ইমরান- ১৬৪)।

বর্ণিত আয়াতের মর্মানুযায়ী জানা যায় যে, নবীদের দায়িত্বের মধ্যে মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা অন্যতম। আর এই দায়িত্ব পালন করতে হলে তাঁকে অবশ্য চিরপবিত্র হতে হবে। এ কারণেই আল্লাহ্তা'লা নবীদের উত্তরাধিকারীকে এইভাবে মহাপবিত্রতা দান করেছেন।

<u>ইমাম হোসাইনকে ভালবাসা বাধ্যতামূলক বা ঈমানের অংশ:</u>

আল্লাহতা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "এটাই সেই বিষয় যার সুসংবাদ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের দান করেন যাঁরা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে। হে রসূল! আপনি বলে দিন। আমি এর (ধর্ম প্রচারের) জন্ম তোমাদের নিকট হতে আমার পরমাত্মীয়দের প্রতি সোহার্দ (মোয়াদ্দাত বা অকৃত্রিম ও চিরস্থায়ী ভালবাসা) ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাহি না এবং যে ব্যক্তি উত্তম কর্ম করবে আমি তাঁর জন্য এতে কল্যাণ বৃদ্ধি করে দেব, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (সূরা শুরা- ২৩)। তাফসীরে 'কাশ্শাফ', 'রূহুল বায়ান', 'তাফসীরে কবীর', 'তাফসীরে দূররে মানসুর' প্রভৃতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াতটি নাযিল হলে মহান নবী (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মদের ভালবাসার উপর মৃত্যুবরণ করে সে শহীদের মৃত্যুবরণ করে, সে পূর্ণাঙ্গ ঈমানসহ মারা যায় তাঁকে মালাকুল মওত ও মুনকির-নাকীর বেহেশতের সুসংবাদ দান করেন। তাঁকে বেহেশতে সেভাবে প্রেরণ করা হবে যেমন নববধূ স্বামীর গৃহে যায়। আর যারা তাঁদের প্রতি শত্রুতায় মৃত্যুবরণ করে, কিয়ামতে তাঁদের ললাটে লেখা থাকবে, "এরা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত।" স্মরণ রেখ তারা কাফির, তারা বেহেশতের সুগন্ধও পাবে না।" তখন জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, তাঁরা কাঁরা যাঁদের ভালবাসা আল্লাহ্ আমাদের জন্য ফরয করেছেন। জবাবে তিনি (রসূল দঃ) বলেন, আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (রাদ্বিঃ)। তিনি আরো বলেন, যারা এদের উপর জুলুম করবে এবং এদের ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দেবে তাদের জন্য বেহেশত হারাম হয়ে যাবে। তাফসীরে সালাবীতে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত 'উত্তম কর্ম' বলতে মহানবী (সাঃ) এর বংশধরদের প্রতি ভালবাসাকে বুঝানো হয়েছে। তাফসীরে কাশ্শাফ্ হতে রেওয়াতটি বর্ণিত হয়েছে। (তাফসীরে কাশশাফ্ ৩য় খন্ড, পৃ- ৬৮)

<u>ইমাম হোসেন (রাদ্বিঃ) এর ইমামত প্রসঙ্গে:</u>

বিশ্ব জাহানের প্রভু। আকাশ ও সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা, মালিক ও শাসনকর্তা তাঁর সুবিশাল সাম্রাজ্যের পরিচালনা করার জন্য তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের 'ইলাহা' তথা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসাবে তিনি তাঁর সৃষ্ট মানবকূলের মধ্য থেকে এমন সব লোকদের নির্বাচিত ও নিয়োগ করে থাকেন। যাঁরা তাঁর উপর দৃঢ়ভাবে ঈমান আনয়ন করেন। তাঁর সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ ও সমন্বয় এবং আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর প্রনয়নকৃত বিধি-বিধান অর্থাৎ আদেশ-নির্দেশ বা আইন অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করে থাকেন। এই সব মহান ব্যক্তিবর্গ হলেন মানবজাতির পথ পদর্শক (হাদী) নবী-রসূল (আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ দাতা ও আল্লাহর প্রতিনিধি। সাধারণভাবে এই সব মহান ব্যক্তিদের নবী-রসূল পদবী ব্যবহার করার জন্য এবং 'ধর্ম' ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্যক না জানার কারণে আমরা তাঁদেরকে শুধু 'ধর্মীয় নেতা' বা ধর্ম প্রচারকারী হিসাবে জানি এবং অন্যান্য পার্থিব কর্মকান্ডে তাঁদের কোন ভূমিকা বা ক্ষমতা রয়েছে বলে মনে করি না। অথচ আল্লাহ্‌তা'লা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে অদ্যাবধি তাঁর নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে এই বিশ্ব পরিচালনা তথা শাসন করে আসছেন। নবী-রসূল পদবী যেন এ বিষয়টি বুঝতে আমাদের কোন বিভ্রান্তিতে না ফেলে অর্থাৎ মানবীয় বিবেচনায় যেন আমরা এদেরকে শুধুমাত্র 'ধর্মীয় নেতা' হিসাবে তাদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ না করি সে কারণে কুরআনে আল্লাহ্‌তা'লা সরাসরি প্রশাসনিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত এই সব মহান ব্যক্তিদের জন্য আরো কয়েকটি পদবী নির্ধারণ ও ব্যবহার করেছেন। এ ধরণের একটি পদবী হলো 'ইমাম'। আল্লাহ্‌তা'লা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন। 'স্মরণ করো যখন ইব্রাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বাক্য (বিষয়ে) দিয়ে পরীক্ষা করলেন, পরীক্ষায় উত্তীন হওয়ার পর আল্লাহ্‌ বল্লেন- আমি তোঁমাকে মানব জাতির 'ইমাম (নেতা, অনুকরনীয় মান্যবর, বিশ্বনেতা) নিয়োগ / নির্বাচন করলাম। সে বলল, আমার বংশ ধরদের মধ্য থেকেও। আল্লাহ্‌ বলেন, (হ্যাঁ কিন্তু) আমার অঙ্গীকার (তথা এ নিয়োগ) জালিমদের জন্য প্রযোজ্য হবে না।" (সূরা বাকারা- ১২৪)।

এই আয়াত থেকে স্থির নিশ্চিত হওয়া গেল যে, আল্লাহ্‌ কর্তৃক এই বিশ্ব পরিচালনা পদ্ধতি আমাদের সাধারণ ধারণা অনুযায়ী শুধু ধর্মীয় কর্মকান্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং পার্থিব কর্মকান্ড ও তাঁদের পরিচালনাধীন। এবং এই কর্মকান্ডে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধরদের এই বিশ্ব পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ও জালিম, ফাসেক, পাপাচারী, দূরাচার, অসৎ ব্যক্তির ইমামতি বাতিল। এ ধরণের ব্যক্তি জনগণের বা জাতির ইমাম তথা নেতা হওয়ার জন্য অযোগ্য। কোন ব্যক্তি যদি স্বঘোষিত পন্থায় এ পদ জেঁকে বসে তবে তার অনুগমন, অনুসরণ, আনুগত্য ও সম্মান করা জনতার জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

অনুরূপভাবে সূরা আম্বিয়ার ৭৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা ঘোষণা করেছেন, "এবং তাহাদিগকে করিয়াছিলাম ইমাম (নেতা) তাহারা আমার নিদের্শ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত ..."। আবার সূরা সাজদার ২৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা এই 'ইমাম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন: "আর আমি উঁহাদের মধ্য হতে ইমাম (নেতা) নির্ধারণ / নিয়োগ করেছিলাম। যাঁহারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করিত (হেদায়েত) যেহেতু উঁহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল আর উঁহারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী।"

আলোচ্য আয়াত সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক নিয়োগকৃত ব্যক্তিবর্গ প্রকৃতপক্ষে জনগণের সার্বিক নেতৃত্বের অধিকারী ছিলেন অর্থাৎ ধর্ম ও রাজনীতি (আমাদের

সংজ্ঞায়) আলাদা কোন বিষয় নয় বরং আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত ইমাম পার্থিব সকল কর্মকান্ড নির্বাহ করবেন। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় এই ধরণের শাসন ব্যবস্থাকে ইংরাজীতে ঞযবড়পৎধপু বাংলায় ঈশ্বরতন্ত্র, ঐশীতন্ত্র বা দিব্যতন্ত্র হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সুলায়মান (আঃ), হযরত মুসা (আঃ) ও আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এই ধরণের আল্লাহর নির্বাচিত জননেতা, শাসক বা ইমাম ছিলেন।

বিদায় হজ্বের পর রসুল (দঃ) ‘গাদীরে খুম’ নামক স্থানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণের মূল ভিত্তি ছিল আয়াতে ‘তাবলীগ’। যা সূরা মায়েদার ৬৭ নম্বর আয়াত: “হে রসূল! পৌঁছে দিন, যা আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি নাজিল হয়েছে। যদি আপনি তা না করেন, তবে আপনি তাঁর রেসালতের কোন কিছুই পৌঁছালেন না। আর আল্লাহ্ আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।” আয়াতটির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত হুকুম যা প্রচার করার জন্য রসুল (দঃ)কে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, তা ভিন্ন মাত্রার এবং বিশেষ অর্থবহ। আর এটা এমনই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ যা উম্মাহকে জানানো না হলে নবুওত ও রেসালতের সমস্ত শিক্ষা কার্যত অকার্যকর বা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আবার হুকুমটি এমনই স্পর্শকাতর যে, তা প্রচার ও বাস্তবায়ন করতে গেলে মানুষের পক্ষ থেকে রসূল (দঃ) এর অনিষ্টের আশংকা রয়েছে। আর সঠিকভাবে এই হুকুম বা নির্দেশনা জানা বা প্রতিপালন না করা হলে সেই সে সম্প্রদায় কার্যত কাফের বা খোদা অস্বীকারকারী হিসাবে পরিগণিত হবে।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূল (দঃ) ১০ হিজরী ১৮ জিলহজ্ব ‘গাদীরে খুম’ নামক স্থানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। সুদীর্ঘ এই ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন।” আলী ইবনে তালিব হলো আমার ভাই, আমার ওয়াসি, আমার খলিফা, ও আমার পরবর্তী ইমাম। আমার সঙ্গে তাঁর মর্যাদা ও সম্পর্ক ঠিক তদ্রুপ যেমন নবী মুসার সঙ্গে হারুনের ছিল। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, আমার পরে আর কেউ নবী হবে না। আল্লাহ্ ও আমার পরে সে (আলী) তোমাদের ওলী (অভিভাবক) অতঃপর কিয়ামত দিনপর্যন্ত আমার ইমামত আমার বংশধারায় জারী থাকবে। যা এর (আলীর) ঔরস থেকে হবে। এ ধারাবাহিকতা ঐ দিন পর্যন্ত জারী থাকবে যখন তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সামনে আখেরাতে উপস্থিত থাকবে। আলী ও আমার সন্তানদের মধ্য থেকে যারা মাসুম (নিষ্পাপ) তাঁরা সকলেই শিকলে আজগর (হালকা ওজনবিশিষ্ট) আর কুরআন হলো শিকলে আকবর (ভারী ওজনবিশিষ্ট)। এ দুটো কখনো আলাদা হবে না যতক্ষন না হাউজে কাউসারে আমার নিকট পৌঁছাবে। এরা হলো আল্লাহর সৃষ্টি, তাঁরা হলেন আমিন, বিশ্বস্ত বা সত্যবাদী এবং আল্লাহর জমিনে তাঁরই মনোনীত হাকীম (শাসক)। আমি হলাম আল্লাহর সিরাতে মুস্তাকীম, যাঁর আনুগত্য করার আদেশ স্বয়ং আল্লাতা’লা দিয়েছেন। অতঃপর আমার পরে (সিরাতে মুস্তাকীম) হলো- আলী, তারপর আমার সন্তানগণ যাঁরা তাঁর ঔরস থেকে হবে। তারাই ইমাম হবে। তারাই সত্যের পথ প্রদর্শক এবং হকের প্রতি ন্যায়পরায়ণ।

হে জনমন্ডলী! কুরআন মজীদ তোমাদের বলে দিচ্ছে যে, এর (আলীর) পরে আগত সকল ইমাম তাঁরই বংশধারার মধ্য থেকে হবে। আল্লাহ্তা’লা এ কথা বলেছেন যে, “তিনি (আল্লাহর) তাঁর (আলীর) বংশধরদের মধ্যেই চিরজীব কালেমাকে স্থায়ী করে দিয়েছেন।” (আল্লামা আবু

মনসুর আহমেদ ইবনে আলী আত তাবারসী (রহঃ) বর্ণিত রসূল (সাঃ) এর ঐতিহাসিক ভাষণটির বঙ্গানুবাদের অংশবিশেষ)।

ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন যে, 'গাদীরে খুমে' প্রদত্ত ভাষণের পর পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি নাজিল হয়- "... আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং আমার নেয়ামত সমূহকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীনে ইসলামের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম।" (সূরা মায়েদা- ৩) পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াত ও খাদীরে খুমে রসূল (দ.) এর ঘোষণা অনুযায়ী সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী-রসূল-ইমাম তথা আহলে বাইয়াত এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত / নির্বাচিত / নিয়োগকৃত মানব জাতির বিশেষ করে মুসলিম জাতির জন্য প্রকৃত ইমাম বা নেতা যাঁরা আল্লাহর নির্দেশে জনগণকে পরিচালনা করেন এবং জনগণকে হেদায়েত করেন।

যে কুরআন ব্যাখ্যাকারী হিসাবে আহলে বায়াত:

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে নবী / রসূলদের দায়িত্ব যা আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন তা হলো: "তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করিবার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা উহার সহিত সঞ্চালন করিওনা: ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করাইবার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর। অতঃপর ইহার বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই।" (সূরা কিয়ামা- ১৬-১৯)

পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াত সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবুওতের উত্তরাধিকারত্ব কোন সাধারণ আরবী ভাষার পান্ডিত্যের ব্যাপার নয় বরং এটি আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কেউ এ দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষও নয়। এ প্রসঙ্গে জানা আবশ্যক যে রসূল (দ.) এর ওফাতের পর আল্লাহর এ বিধান লঙ্ঘন করা হয়। ফলে নবুওতের উত্তরাধিকার তথা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব দুইটি আলাদা হয়ে যায়। অর্থাৎ পার্থিব রাষ্ট্রীয় তথা রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও আধ্যাত্মিক তথা ধর্মীয় নেতৃত্বের মধ্যে এক মারাত্মক বিরোধ সৃষ্টি হয়। ফলে ইসলাম ধর্মে এক ব্যাপক ফিতনার সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে ইসলাম ধর্মীয় সকল ফিরকার সমাধান এই বিষয়ের সঠিক সমাধানের উপর নিহিত রয়েছে যাহোক পরবর্তীতে 'ইমাম' পদবী নিয়ে যথেচ্ছাচার শুরু হয়। তাই আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত ইমামের কনসেপ্ট (ঈড়হপবভঃ) সমাজ থেকে বলপূর্বক অপসারণ করা হয় এবং এর বদলে মানব সৃষ্টি ইমাম পদবী ব্যবহারের রেওয়াজ চালু করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, খেলাফতে রাশেদার সময় রাষ্ট্রীয় প্রধান কেন্দ্রে ও রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক নিয়োগকৃত প্রাদেশিক প্রশাসক বা গভর্নরগণ নামাজের ইমামতি করতেন। তাদেরকে ইমাম বলা হতো না। বা তাদের পদবী ও ইমাম ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে উমাইয়া শাসকগণ তাদের কুকর্ম ও অপশাসনের জন্য জনগণকে ভয় পেত এবং জণগণের কাছে জবাবদিহিতার ভয়ে তারা সালাতে ইমামতির দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করতে থাকে। ফলে শুধুমাত্র অন্যান্য লোকদের সালাত আদায়ের দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার কর্তৃক একজন ব্যক্তিকে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা হয় এবং তিনি জনগণের সালাতের ইমাম হয়ে গেলেন। অথচ সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তার কোন ভূমিকাই ছিল না বর্তমানেও বিরাজমান। আবার কোন ব্যক্তি আরবী ভাষা বা

কুরআন / হাদিস নিয়ে প্রচুর গবেষণা করলেন তাদেরকে আলাদাভাবে ইমাম খেতাব দেওয়া হলো। উল্লেখ্য, এ সব মহান ব্যক্তিবর্গ / ধর্মীয় গবেষকগণ কখনও নিজেদেরকে আল্লাহ্ কতৃক নিয়োজিত ইমাম হিসাবে দাবী করেননি। অথচ আহলে বায়াত-এ রসূল গাউসুল আযম শেখ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জীলানী তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কাসিদা শরীফে স্বয়ং উল্লেখ করেছেন-

"করিল প্রভু বাদশা (ইমাম / নেতা / প্রশাসক) মোরে

সকল ওলী কুতুবদের

ত্বরীকা মোর রহিবে জারী

হোক না যত রকম ফের।"

অথচ তাঁর নামের পূর্বে ইমাম পদবী ব্যবহার করা হয় না। অর্থাৎ আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত বাদশা বা ইমামের ক্ষেত্রে ইমাম পদবী ব্যবহার করা হয় না। অথচ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যাকে 'ঈমাম' মনে করেন তিনিই 'ইমাম' পদবীতে ভূষিত হন। ফলে মুসলিম সমাজ / রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় 'ইমাম-ইমামত' সম্পর্কে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তা'লা যে বিশেষ অর্থে ইমাম শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং এর সাথে মানবীয় সকল কর্মকান্ডে আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত / নির্বাচিত / নিয়োগকৃত ইমাম এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে তা মুসলিম জনতা ভুলে গেছে। পবিত্র কুরআন ও রসূল (দঃ) এর প্রমান্য হাদীসের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করেছি যে, হযরত ইমাম হোসাইন (রাদ্বিঃ) হলেন, নবীর উত্তরাধিকারী, পবিত্র কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যাকারী, সিরাতুল মুস্তাকীম তথা আল্লাহর নিয়োগকৃত ইমাম বা শাসক।

<u>হযরত ইমাম হোসাইন (রাদ্বিঃ) এর আমীরুল মোমেনীন হওয়ার প্রেক্ষাপট:</u>

হযরত ওসমান (রাদ্বিঃ) (৬৫৬ খৃঃ) শাহাদাতের পর হযরত আলী (রাদ্বিঃ) ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরুল মোমেনীন হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনিই একমাত্র খলীফা যিনি প্রকাশ্যে মসজিদে জনগণের ভোটে নির্বাচিত। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তদানীন্তন মুসলিম সমাজে ইমামত ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়ে এক চরম অবস্থার সৃষ্টি হয়। তারই ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়ে জনমনে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে অরাজকতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে জন মানুষের শ্রদ্ধা ও আস্থা বহুলাংশে হ্রাস পায়। তাই আমরা দেখতে পাই যে, হযরত আলী (রাদ্বিঃ) যখন হযরত ওসমান (রাদ্বিঃ) কর্তৃক নিয়োজিত দুর্নীতিবাজ উমাইয়া গভর্ণরদেরকে বরখাস্ত করেন। তখন সিরিয়ার গভর্ণর মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান কেন্দ্রিয় খেলাফতের নির্দেশ অমান্য করে এক পর্যায়ে আলী (রাদ্বি)'র বিরুদ্ধে এক প্রতারণামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইতিহাসে এই যুদ্ধকে 'সিফফীনের' যুদ্ধ হিসাবে অভিহিত করা হয়। এই যুদ্ধে (৬৫৭ খৃষ্টাব্দে) উমাইয়া শাসক কর্তৃক আল্লাহর পবিত্র কুরআন বর্শায় মাথায় নিয়ে এক ভয়াবহ প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয়। ইসলামের জঘন্যতম শত্রু আবু সুফিয়ান। তিনিই মুহাম্মদ (দঃ) এর বিরুদ্ধে ওহুদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধে কাফেরদের নেতৃত্ব দান করেন। ইসলামকে ধ্বংস করার এমন কোন প্রচেষ্টা বাকী ছিল না, যা আবু সুফিয়ান করেন নাই। ইসলামের অন্য এক জঘন্য শত্রু উৎবা। এই উৎবার কন্যা হিন্দা। ইসলামের দুশমন এই জঘন্য দম্পতির পুত্র মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান। উৎবা বদর যুদ্ধে হযরত হামজা (রাদ্বিঃ)'র কর্তৃক নিহত হন। ওহুদের যুদ্ধের সময় তার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হিন্দা ওয়াসী নামক এক বর্শায় লক্ষ্যভেদী ব্যক্তিকে নিয়োগ করে। সে যুদ্ধের তৎকালীন রীতিনীতি ভঙ্গ করে হযরত হামজা (রাদ্বিঃ)কে শহীদ করে। রসূল (দঃ) এর শ্রদ্ধেয় চাচার পবিত্র দেহ মোবারক হিন্দা

বিকৃত করে তার নাক, কান কেটে মালা তৈরী করে গলায় পরে। এমনকি হিন্দা তাঁর হৃৎপিন্ড বের করে চিবিয়েছিল। আবু সুফিয়ান দম্পতি ৬৩০ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী মক্কা বিজয়ের সময় জীবন রক্ষার খাতিরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এই সময়ে এই দম্পতির সুযোগ্য পুত্র হিসাবে মাবিয়া ইসলামে দাখিল হয়। মুসলমান হলেও রসূল (দঃ) হিন্দার মুখ দর্শনে অস্বীকৃতি জানান। তাই রসূল (দঃ) যার মুখ দেখতে চান না তার চেয়ে হতভাগা আর কে হতে পারে। এই মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান তার পিতা-মাতার কুকর্মের পূর্ণ অনুসারী ও উত্তরাধিকারী হিসাবে ইসলামের বৈধ খলীফা রসূলের ওয়াছী ও নবুওতের বৈধ উত্তরাধিকারীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, গুপ্ত হত্যা, কুটনীতি, মিথ্যাচার, ঘুষ ও বিচারের প্রহসন প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় মুসলমানদের নেতা হয়ে বসে। কি পদ্ধতিতে সে ক্ষমতা কুক্ষিগত করল সেই পদ্ধতির ও কার্যকলাপের বৈধতা বা অবৈধতার বিষয়ে প্রশ্ন না করে বর্তমানেও মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এক শ্রেণীর লোক বুঝে অথবা না বুঝে তার অনুসারী হয়ে রয়েছেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মাবিয়া অন্যায়ভাবে কেন্দ্রিয় খলিফা আমীরুল মোমেনীন হযরত আলীর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং এক পর্যায়ে মাবিয়া ইবনে সুফিয়ানের সৈন্যগণ বর্শার মাথায় পবিত্র কুরআনের পাতা ছিড়ে বলতে থাকে, "এই কুরআন আমাদের মধ্যে ফায়সালাহ করবে।" এই কুরআনী প্রতারণার দ্বারা হযরত আলী (রাদ্বিঃ)'র সৈন্য বাহিনী বিভ্রান্তি হয় এবং হযরত আলীর সৈন্য বাহিনী তাঁর বৈধ নির্দেশ কার্যত অমাণ্য করে। ফলে তিনি যুদ্ধ বিরতি করতে তাঁকে বাধ্য হন। অতঃপর হযরত আলী (রাদ্বিঃ) ও মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের পক্ষে দুইজন সালিশকারী নিয়োগ করা হয়। মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের প্রতিনিধি আমর ইবনুল আস এর প্রতারণামূলক বাক্য জালে হযরত আলী (রাদ্বিঃ)'র প্রতিনিধি আবু মুসা আলি আশআরী বিভ্রান্ত হন। ফলে ইসলামী সাম্রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এবং মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান স্বাধীন নৃপতি ন্যায় ব্যবহার করতে লাগলেন। তিনি সমস্ত মসজিদে মসজিদে হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর গালি গালাজের নীতি প্রচলন করলেন যা উমাইয়া শাসক যা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রাঃ) এর সময়কাল পর্যন্ত বহাল ছিল। ৬৬১ খৃষ্টাব্দে হযরত আলীর শাহাদাতের পর মাবিয়া আমীরুল মুমেনীন উপাধি ধারণ করে তার নিজের ধাঁচে ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন।

<u>হযরত হাসান (রাদ্বিঃ) এর খিলাফত:</u>

আল্লাহর নির্দেশ ও হযরত রসূল (দঃ) এর সুন্নত মোতাবেক হযরত আলী (রাদ্বিঃ) ওছীয়তনামা রেখে যান। 'সিফফীনের' যুদ্ধের পর যেটা লিখা হয়: "এটি আল্লাহর বান্দা আলী ইবনে আবু তালিবের ওছীয়তনামা। আল্লাহর রহমত হাসিলের জন্য তার সম্পত্তি কিভাবে ব্যায়িত হবে এটা তারই নির্দেশ। (অর্থাৎ তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন)। যে রহমত তাঁকে দেবে শান্তি আর বেহেশতের প্রবেশাধিকার। আমার পর আমার পুত্র হাসান (রাদ্বিঃ) হবেন আমার সম্পত্তির মুতওয়াল্লী বা তত্বাধায়ক ও পরিচালক। তিনি আল্লাহর হুকুম আর ইসলামী আইন অনুসারে গরীব, দুঃখী, অভাবগ্রস্তদের সাহায্যে এ সম্পত্তি থেকে ব্যয় করতে পারবেন। যদি হাসান (রাদ্বিঃ)'র কিছু ঘটে আর হোসাইন (রাদ্বিঃ) জীবিত থাকেন তাহলে হাসানের পর তিনিই মুতওয়াল্লী ও তত্বাবধায়ক হবেন। এবং এখানে লিখিত নির্দেশ মোতাবেক কাজ করবেন। (হযরত আলী (রাদ্বিঃ) আবুল ফজল, পৃ. ১৬১)

উক্ত অসীয়তের মর্মানুযায়ী আমীরুল মোমেনীনের হযরত আলীর পর হযরত ইমাম হাসান আমীরুল মুমেনীন হিসাবে নিয়োজিত হন। ইরাকীদের হযরত হাসান (রাদ্বিঃ) খলীফা ঘোষণা এবং হিজাজ, ইয়েমেন, পারস্য হতে কোন প্রতিবাদের অনুপস্থিতি ছিল মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের জন্য একটি বিরাট ভয়ের কারণ। কারণ মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান হযরত ওসমান (রাদ্বিঃ) এর শাহাদতের পর থেকেই ক্ষমতা দখলের অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। বর্তমানে যেহেতু আলী (রাদ্বিঃ) আর জীবিত নাই তাই শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পথকে একেবারে নিষ্কন্টক দেখতে পেয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে আর দেরী করলেন না। তিনি হযরত হাসান (রাদ্বিঃ)কে আমিরুল মোমেনীন বা খলিফা হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন। তাছাড়া তিনি হাসান (রাদ্বিঃ) এর বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করার জন্য বহু গুপ্তচর নিয়োগ করেন। এসব গুপ্তচরেরা নানা মিথ্যাচার অপপ্রচার ও হযরত হাসানের অনেক সেনা নায়কদের ঘুষ বা ভয় দেখিয়ে আবার ক্ষেত্র বিশেষে গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে তাঁর খেলাফতের অধীনস্থ বিভিন্ন এলাকায় এক ধরণের ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ফলে সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও ট্রান্স জর্ডানের সমস্ত সেনাপতিদের ডেকে ব্যপক যুদ্ধের আয়োজন করে। অল্পদিনের মধ্যে সিরিয়াধিপতি ষাট সহস্রের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মেসোপটোমিয়া থেকে মাসকিমনের মধ্যে সাওয়াদের দিকে টাইগ্রীস নদীর তীর ধরে হযরত হাসান (রাদ্বিঃ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। হযরত হাসান (রাদ্বিঃ) এর সংক্ষিপ্ত খেলাফতকাল ছিল ছয় মাস। খিলাফতের ইতিহাস, ধর্ম ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উত্তরাধিকার প্রভৃতি ইসলামের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে হযরত ইমাম হাসান (রাদ্বিঃ) ও মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের মধ্যে এই সময়কার পত্রালাপ আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস।

হযরত হাসান (রাদ্বিঃ) তাঁর পত্রে মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানকে রসূল (সাঃ) এর ওফাতের পর আহলে বায়াতদেরকে খিলাফত হতে বঞ্চিত করার ঘটনাবলী পূনর্ব্যক্ত করে তাঁর পত্রে লিখেছিলেন:

"... আর এখন হে মাবিয়া, তোমার অধিকার চর্চার দৃশ্য দেখাটা কি গভীর মর্ম বিদারক। কি অদ্ভুত! দ্বীনের ক্ষেত্রে তোমার কোন খ্যাতি নাই। তোমার মধ্যে ইসলামের এমন কোন আসন নাই যা কখনো প্রশংসিত হয়েছে, বরং তুমি হচ্ছো গিয়ে হিযবে মিনাল আহযাবো" (মাবিয়া ও তার কুখ্যাত পিতা মদীনা ধ্বংস করার যে প্রয়াস গ্রহণ করেছিল তার ইঙ্গিত)। তোমার পিতা ছিলেন কুরাইশদের মধ্য হতে রসূল (দঃ)'র সবচেয়ে বড় শত্রু। সুতরাং বাতিলের পক্ষে সংগ্রাম করা থেকে বিরত হও এবং অন্যান্যদের মতো তুমিও আমার আনুগত্য স্বীকার করে নাও। এটাও তুমিও সুনিশ্চিত জান যে, আল্লাহ্, ফেরেশতাকুল ও বিবেকবাণদের দৃষ্টিতে খেলাফতের ব্যাপারে আমি তোমার চেয়ে যোগ্য। সুতরাং তোমার উচিত আল্লাহকে ভয় করা ও বিদ্রোহ পরিত্যাগ করা মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করো না। তবে তুমি যদি বিদ্রোহ ও পথভ্রষ্টতার নীতি অব্যহত রাখ, তাহলে আমি মুসলমানদের নিয়ে তোমাকে আক্রমন করব এবং আল্লাহর নির্দেশনা আসা পর্যন্ত তোমার বিনাশে সচেষ্ট থাকব। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনিই একমাত্র যার নির্দেশ সর্বশ্রেষ্ঠ।" (বালাযুরী, আনসাব আল আশরাফ, খন্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৩০)

এই পত্রের উত্তরে মাবিয়া ইবেন আবু সুফিয়ান বিভিন্ন মিথ্যাচার ও কুটতর্কের জাল বিস্তারমূলক বক্তব্য উপস্থাপন করে সে তার মতামত ও সিদ্ধান্ত হিসাবে লিখেন যে ..." আমি তোমার চেয়ে অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও বয়োজ্যেষ্ঠতার কারণে তোমার উচিত আমার নিকট নতি স্বীকার

করা। আমার পরে খেলাফত তোমার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হবে। তুমি চাইলে ইরাকের বাইতুল মাল থেকে যত খুশী নিতে পার। তাছাড়া ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য ইরাকের যে কোন অঞ্চল থেকে তুমি কর আদায় করতে পার। সুতরাং হে আবু মুহাম্মদ! (হাসান)! তোমার নিজের ও তোমার দ্বীনের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করো ...।" পরবর্তীকালে মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান ইমাম হাসান (রাদ্বিঃ) এর নিকট আরেকটি পত্র লিখেছিল যাতে লিখা ছিল। "... যদি তুমি আমার নিকট খেলাফত হস্তান্তর করো এবং আমার হাতে বাইয়াত হও, তবে আমি আমার সকল ওয়াদা পূরণ করবো এবং তোমার সঙ্গে করা সকল চুক্তি মেনে চলব। তাছাড়া আমার পর খেলাফত তোমার নিকটেই থাকবে। কারণ সকলের মধ্যে তুমিই এর যোগ্য" (আবুল ফারাজ, মাকাতিল আল তালিবিন, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৩৮) অতঃপর নিম্নোক্ত ধারা ও শর্তগুলোর উপর ভিত্তি করেই ইমাম হাসান বিন আলী ও মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের মধ্যে সন্ধি সম্পন্ন হয়েছিল-

১। হাসান বিন আলী মাবিয়ার নিকট শাসন ক্ষমতা বা সরকার ব্যবস্থা (খিলাফত / ইমামত নয়), যাতে সে আল্লাহর কুরআন, রসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী ধার্মিক ও আমানতদার খলিফাদের ন্যায় পরিচালনা করেন।

২। তার (মাবিয়ার পরবর্তীকালে) কাউকে খলিফা মনোনয়ন দেয়ার ক্ষমতা মাবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের থাকবে না। তারপর খেলাফত হাসান বিন আলীর নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাঁর অবর্তমানে হোসাইন বিন আলীর উপর তা বর্তাবে।

৩। সিরিয়া, ইরাক, তোহামা, হেযাজ বা যে কোন অঞ্চলের সাধারণ জনতার জান, মাল, ইজ্জত নিরাপদ থাকবে।

৪। হযরত আলী এবং তার পরিবারের সকল সদস্যেরও অনুসারীদের জান-মাল ইজ্জত সুরক্ষিত থাকবে। আর এ বিষয়ে মাবিয়া বিন আবু সুফিয়ান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ থাকবে এবং আল্লাহর সঙ্গে কৃত এই ওয়াদা প্রতি সম্মান বজায় রাখবে।

৫। হাসান বিন ও রাসূল (সঃ) এর আহলে বাইতদের বিরুদ্ধে মাবিয়া বিন আবু সুফিয়ান গোপনে বা প্রকাশ্যে কোন প্রকার আক্রমন করতে পারবে না। এবং তাঁদের কাউকে পৃথিবীর কোন ভূখন্ডে আতংকিত করতে পারবে না।

৬। হযরত আলীকে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করা হবে এবং তাঁকে কোন প্রকার গালাগালাজ দেয়া যাবে না।

সন্ধির শর্ত প্রতিপালন করার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ:

সুতরাং তাঁরা তাদের অংঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদের লা'নত দিয়েছি এবং তাদের অন্ত রসমূহ করেছি কঠোর তাদের শব্দ গুলোকে আপন স্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদের যে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তার একটি অংশ তারা ভুলে গিয়েছে এবং তুমি তাদের থেকে খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হতে থাকবে, তাঁদের অল্প সংখ্যাক ছাড়া। ... (সূরা মায়েদা- ১৩)।

"যারা আল্লাহর দৃঢ়কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্ যা জোড়া লাগোনোর নির্দেশ নিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং জমীনে ফাসাদ করে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ।" (সূরা বাকারা- ২৭)

ইতিহাস সাক্ষী মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান হযরত ইমাম হাসান (রাদ্বিঃ) এর সাথে সম্পাদিত চুক্তির কোন ধারাই প্রতিপালন করেন নাই। বরং ইসলাম ধর্মীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

আদেশ-নিষেধ বা বিধি-বিধান ও মহান আহলে বাইত ও তাঁদের অনুসারীদের আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা, সরকারী চাকুরী থেকে অপসারণ, হত্যা, গুম, খুন, বিচারের নামে প্রহসন ও নির্যাতন উমাইয়া শাসকগণ তাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত একটি প্রণালীবিদ্ধ নীতি হিসাবে বাস্তবায়ন করে। পরবর্তীতে আব্বাসীয় খলিফাদের অনেকেই এই অধর্মীয় নীতি অনুসরণ করেন। ইতোমধ্যে মাবিয়ার ইঙ্গিতে হযরত হাসানকে (রাদিঃ) বিষপান করানোর ফলে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। যাহোক, এই চুক্তির আওতায় মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের মৃত্যুর (৬৮০ খৃ:) পর হযরত ইমাম হোসাইন (রাদ্বিঃ) আমিরুল মোমেনিন পদে অধিষ্ঠিত হন। অর্থাৎ এই চুক্তির আলোকেই হযরত ইমাম হোসাইন একই সাথে ধর্মীয় দিক থেকে নবীর উত্তরাধিকারী তথা আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত জনগণের ইমাম-নেতা-পরিচালক ও শাসক। আবার রাজনৈতিকভাবে তিনি মুসলমানদের নেতা তথা আমিরুল মোমেনীন পদে অধিষ্ঠিত হন। মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান সন্ধি চুক্তি সম্পন্ন করার পর দামেসকো ফিরে এসে তার সকল আস্থাভাজন লোকদের সমবেত হওয়ার নিদের্শ দিলেন। তাদের সকলের উপস্থিতিতে মাবিয়া দাড়িয়ে বলতে লাগলো, "হে লোকেরা! আল্লাহর নবী আমাকে বলেছিলেন, অবশ্যই তুমি আমার পরে ক্ষমতা হাতে পাবে। ন্যায়পরায়ন লোকদের দ্বারা শাসন কাজ চালাবে। আমি তোমাকে মনোনীত করলাম। আবু তোরাব (হযরত আলী রাদ্বিঃ) কে অভিসম্পাত করবে। (কি জঘণ্য মিথ্যাচার) এরপর থেকে মূলত হযরত আলীর প্রতি লা'নত বর্ষণের প্রথার প্রচলন করা হয়। (ইবনে আবল হাদিদ, শরহে নাহাজুল বালাঘা, খন্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৩৬১)।

এই বক্তব্যের পর থেকেই মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান জাহেলিয়াতের প্রথা অনুযায়ী হযরত আলী (রাদ্বিঃ) এর প্রতি লা'নত দিতে থাকে এবং রাষ্ট্রের সকল মসজিদের মিম্বার থেকে একযোগে জুমাহ্ ও ঈদের নামাজের খুতবায় হযরত আলীর প্রতি অভিসম্পত রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করা হয়। বক্তব্য শেষ করে মাবিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগলো- হে আল্লাহ্ আলীর প্রতি লা'নত বর্ষণ করো (নাউজুবিল্লাহ্ মিনজালিক) কারণ সে তোমার দ্বীনকে অস্বীকার করেছে এবং তা থেকে মুখ ফিরেয়ে নিয়েছে এবং তাকে জাহান্নামের সুকঠিন শাস্তি দান কর (নাউজুবিল্লাহ্ মিনজালিক), (আল নাসাই আল কাফিয়াহ, পৃ. ৭২) এই সভা শেষে মাবিয়া তার সকল গভর্ণরদের প্রতি রসূল্লাহ (দ.) এর ভাই তার ওয়াছী বা উত্তরাধিকারী মহান আহলে বাইয়াত এ রসূল যাদের মর্যাদা ও পবিত্রতা ও যাদেরকে ভালবাসা ফরজ বলে আল্লাহ্ কুরআনে ঘোষণা করেছেন তাঁর প্রতি লা'নত বর্ষনের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি প্রজ্ঞাপন জারী করা হয় (নাউজুবিল্লাহ্ মিনজালিক)। এই ধর্মীয় অপপ্রচার ও মিথ্যাচার এবং নবীবংশের প্রতি লা'নতের ফলেই ইয়াজীদ এত বিপুল সংখ্যক নবীবংশ বিদ্বেষী সেনাবাহিনী গঠনে সমর্থ হয় এবং যারা হযরত হোসাইন (রাদ্বিঃ) এর হত্যা ও তাঁর পরিবারকে নির্যাতন ও অবমাননা করার মত জঘন্য অপরাধ করতে তৎপর হয়। তাছাড়া এই প্রচারনার কতখানি গভীরভাবে মুসলিম সমাজে প্রোথিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন সিরিয়া দেশের কতিপয় আলেম ও মাশায়েখ আব্বাসীয় খলিফা আবুল আব্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। খলীফা তাহাদিগকে বলেন," তোমরা সর্বদা বনু ও উমাইয়ার হিতৈষী রহিয়াছ। কখনও বনি হাশিমের নিকট আস নাই। তোমরা একথা মনে কর নাই যে, বনি হাশিম রসূল (দঃ) এর বংশ তথা আত্মীয়।" সেই আলেম ও মাশায়েখগণ কসম খাইয়া বলিয়াছিলেন, আজ পর্যন্ত আমাদের ছিল না যে বনি হাশিম রসূল (দঃ) এর আত্মীয়। আমরা জানি যে, বনু উমাইয়াগণ সকল সম্মানের মালিক। (খিলাফতের ইতিহাস লেখক আব্দুল জব্বার সিদ্দিকী, পৃ. ১৪৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন) তদানীন্তন মুসলিম

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমদের যখন রসূল বংশীয় জ্ঞানের মাত্রা এই ধরনের থাকে তবে সাধারণ লোকের এ সম্পর্কিত ধারণা কি ছিল তা সহজেই অনুমেয়। এই প্রেক্ষাপটে হযরত ইমাম হোসেনকে তাঁর নবুওতের উত্তরাধিকারী ও বৈধ আমিরুল মোমিনীন হিসাবে ভূমিকা রাখতে হয়।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের নীতি:

মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে রঈসুল মুফাসসিরিনের (কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ মোফাসসির) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সাথে বিতর্ক হয়। সেই বিতর্কে মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান নিজেকে হযরত আলীর চেয়ে যোগ্য প্রমাণের ঘৃণ্য ও ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। ঐতিহাসিকদের সূত্র মতে সন্ধির বছরের শেষে মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান কাবা যিয়ারত গমন করেছিলেন। সেখানে সে একদল কোরাইশের পার্শ্ব অতিক্রম করছিল। সেখানে উপস্থিত সকলেই তার সম্মানে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস দাঁড়াননি।

তখন মাবিয়া তাকে বলল- ওহে ইবনে আব্বাস। সিফফিন যুদ্ধে তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধেও ফলে সৃষ্ট ক্ষোভ কি তোমার অন্যান্য সাথীদের মতো আমার সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতে বাধা দিয়েছে? নিশ্চয়ই ওসমান মজলুম অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছিল।" উত্তরে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে দেখিয়ে বল্লেন- উমর ইবনুল খাত্তাবও মজলুম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তিনি তার 'কিসাসের' ভার পুত্রকে দিয়েছিলেন। আর এই তার পুত্র। (মাবিয়া যে হযরত ওসমান (রাদ্বিঃ) এর শাহাদতের জন্য 'কিসাস' এর দাবী উত্থাপন করেছিলো তা প্রকৃতপক্ষে শরীয়ত সম্মত ছিল না তার প্রতি ইঙ্গিত)।

মাবিয়া বল্লেন- নিশ্চয় তাকে (হযরত ওসমান (রাদ্বিঃ) কোন কাফের হত্যা করেছিল?

ইবনে আব্বাস বল্লেন- কে তাকে (হযরত ওসমান (রাদ্বিঃ) হত্যা করেছে?

মাবিয়া-তাকে মুসলামানরা হত্যা করেছে।

ইবনে আব্বাস- তাহলে (তা তোমার দাবী প্রত্যাখ্যান করার জন্য এটাই যথেষ্ট। যদি মুসলামানেরা তাকে অমর্যাদা ও হত্যা করে থাকে এখানে জুলুমের কোন অবকাশই থাকে না।

মাবিয়া- আমরা সকল স্থানে কিতাবে লিখে দিব। যেখানে আলী ও তার পরিবারের গুণগান থেকে লোকেরা বিরত থাকবে। এরপর তোমার জিহ্বাকে বন্ধ করা হবে। ওহে ইবনে আব্বাস।

ইবনে আব্বাস- তুমি আমাদেরকে কুরআন পড়া থেকে বিরত রাখতে চাও?

মাবিয়া- না।

ইবনে আব্বাস- তুমি কি এর ব্যাখ্যা থেকে আমাদের দূরে রাখতে চাও?

মাবিয়া- হ্যাঁ।

ইবনে আব্বাস- তাহলে কি আমরা কুরআন পড়তে পারব, অথচ জিজ্ঞাসা করতে পারব না যে এখানে আল্লাহ্ কি বলেছেন?

মাবিয়া- হ্যাঁ।

ইবনে আব্বাস- আমাদের জন্য কোনটা ওয়াজিব? কুরআন তেলওয়াত করা নাকি কুরআন অনুযায়ী আমল করা?

মাবিয়া- কুরআন অনুযায়ী আমল করা।

ইবনে আব্বাস- তাহলে যা তিনি আমাদের প্রতি নাজিল করেছেন তা যদি আমরা না জানি কিভাবে আমরা সেই অনুযায়ী আমল করব?

মাবিয়া- এ ক্ষেত্রে তাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে। যাদের ব্যাখ্যা তোমার ও তোমার পরিবারের ব্যাখ্যা থেকে ভিন্নতা পোষণ করে।

ইবনে আব্বাস- কুরআনে আমাদের পরিবারের কাছে নাজিল হয়েছিল। আমি কি এ সম্পর্কে আবু সুফিয়ান ও আবু মুহিতের পরিবারের কাছে জিজ্ঞাসা করতে পারি?

মাবিয়া- কুরআন তেলওয়াত তাহলে তোমাদের সম্পর্কে যা নাজিল হয়েছে এবং রসূল (দঃ) যা বলেছেন তা ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। অন্য কোন কিছুর ব্যাখ্যা দিতে পারো।

ইবনে আব্বাস- আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, ওরা চায় মুখের ফুঁৎকারে আমার নুরকে নিভিয়ে দিবে। কিন্তু আমি আমার নূরকে প্রজ্জ্বলিত রাখব। যতই তা কাফেরদের জন্য তা গাত্র দাহের বিষয় হোক না কেন? (সূরা তাওবা- ৩২)।

মাবিয়া প্রতিউত্তরে বলল- ওহে ইবনে আব্বাস, আমার থেকে নিজেকে আড়াল করে রেখ এবং তোমার জিহ্বাকে আমার থেকে হেফাজত করো। যদিও তুমি এসব বলো তবে গোপনে। কারো সম্মুখে প্রকাশ্যে এসব বলতে চেষ্টা করো না। (শরহে নাহজুল বালাঘা, খন্ড- ৩, পৃ.- ১৫)

এই বিতর্কে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মাবিয়া তথা উমাইয়া শাসকগণ কুরআন ও হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন সেন্সরশীপ আরোপ করেছিল। ফলশ্রুতিতে কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যাজনিত ভিন্নতা তথা পরস্পর বিরোধিতা একটি স্থায়ী ধর্মীয় সমস্যার সৃষ্টি করে। যা অদ্যাবধি বিরাজমান। আর এ কারণেই পবিত্র কুরআনের তাফসীর প্রণয়ন ও হাদিসের সংকলন সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত হতে এতো দীর্ঘ সময় লেগে গেছে। আর এ কারণেই কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যার ব্যাপারে বর্তমান সময় পর্যন্ত মতবিরোধীতা বা পরস্পর বিরোধীতা রয়েছে।

মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের দৃষ্টিতে ইয়াজীদ:

মাবিয়া ইয়াজীদের সকল প্রকার অবৈধ কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত ছিল। তাই তার সংশোধনের জন্য পত্রের মাধ্যমে জানাল যে- "আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি শরাব আর বাইজী নিয়ে আসরে মত্ত থাকো। তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেছেন- তোমরা কি প্রতিটি স্থানে বেহুদা স্তম্ভ নির্মাণ করছ? আর তোমরা সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্মাণ করছ। যেন তোমরা স্থায়ী হবে। (সূরা আশশুয়ারা, ১২৮-১২৯)।

তুমি পাপকে এমন প্রকাশ্যে আনজাম দাও যে, আমাদের গোপন বিশ্বাস এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। জেনে রেখ, ওহে ইয়াজীদ। মাতলামি তোমাকে আল্লাহর দরবারে তাঁর রহমত ও করুনার জন্য শুকরিয়া আদায়ের সুবিধা সম্পর্কে জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করে রাখছে যা সবচেয়ে বড় অপরাধ ও দূর্ভাগ্য। তুমি প্রাত্যহিক সালাতে অংশগ্রহণ করছ না, যা আমাদের পরিকল্পনার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। অথচ তুমি অবলীলায় তোমার অযোগ্যতা, পাপ, অপরাধ এবং গোপন বিষয়গুলো প্রকাশ করে দিচ্ছো।" (অলি আকৃদ আল ফারিদ, খন্ড- ২, পৃষ্ঠা- ৩০) মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান তার পুত্র ইয়াজিদের পাপাচারী জীবন সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিল। সেখানে কিভাবে সে এমন এক ব্যক্তিকে মুসলমানদের উপর শাসন ক্ষমতার জন্য মনোনীত করতে পারে? প্রকৃতপক্ষে সে ইসলাম ধর্মের নৈতিক মূল আদর্শ বিশ্বাস করতো না এবং উমাইয়া বংশীয় সামাজিক মতাদর্শের পরাজয়ের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার ও জাহেলিয়াতের যুগ থেকে

লালিত তার পূর্ব পুরুষদের অনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ছিল মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের অন্যতম উদ্দেশ্য।

মুসলিম উম্মাহর উপর ইয়াজিদের শাসন কতৃত্ব করার ক্ষেত্রে মাবিয়া কোন উপায়কেই বাদ রাখেনি। জাহেলিয়াতের যুগের রীতি-নীতিতে সে জনগণকে সাত বছর ধরে অভ্যস্ত করে নিচ্ছিল। বহু উমাইয়াদের পাপাচারী সদস্যদেরকে রাষ্ট্রের সকল স্থানে ছড়িয়ে দিয়ে, তাদের অর্থের বিনিময়ে তার দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের নেতাদের মুখবন্ধ করেছিল। এ জন্যই ইসলাম নেতৃত্বের বিষয়ে এত গুরুত্বারোপ করেছে। কারণ নেতৃত্ব এমন একটি বিষয় যার পদস্খলনে পুরো জাতি পথভ্রষ্ট হয়। যদি নেতৃত্ব তার সঠিক স্থানে না থাকে তখন কোন জাতির না থাকে আত্মমর্যাদা আর না থাকে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ক্ষমতা। ইয়াজীদ যখন ৬৮০ খৃষ্টাব্দে রাষ্টীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তখন মুসলিম উম্মাহর মূল ইসলাম ধর্মীয় চিন্তা চেতনার পরিবর্তে ব্যাপক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিকৃতি ও বিভ্রান্তি রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে- যথা খলীফা নিয়োগের রীতিতে পরিবর্তন, খলীফাদের জীবন-যাত্রার পরিবর্তন, রায়তুল মালের মালিকানার পরিবর্তন। স্বাধীন মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতার বিলুপ্তি। বংশীয় এবং গোত্রীয় ভাবধারার উদ্ভব, যুদ্ধ ও জেহাদের সংজ্ঞা পরিবর্তন, আইনের শাসনের অবসান, সর্বোপরি কুরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যা তো রয়েছে।

<u>বাইয়াত ও এর তাৎপর্য:</u>

বাইয়াত শব্দের অর্থ হলো বিক্রী হওয়া, বিনীত হওয়া অর্থাৎ আনুগত্য স্বীকারকারী ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় কাজ করার স্বাধীনতা বর্জন করার নাম বাইয়াত। অর্থাৎ এই আনুগত্যে ফলশ্রুতিতে কেহ কোন প্রশ্ন না করে নিজের জীবন বিসর্জনের জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে। এই প্রথা তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীনদের প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃত পদ্ধতি ছিল। বাইয়াত বা আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি (ঙধঃয ড়ভ অষষবমরধহপব) এর তাৎপর্য হলো শপথকারী স্রষ্টার নামে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করবেন যে, কোন অবস্থাতেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির বিরোধীতা করবে না। বাইয়াত গ্রহণ করার পর প্রাণের ভয়ে বা বস্তুগত সুবিধার লোভে তা প্রত্যাখ্যান করা ধর্মীয় দিক থেকে প্রায় অসম্ভব ও সমাজিক দিক থেকে খুব অবমাননাকর ছিল। তৎকালীন সামাজিক রীতি অনুযায়ী বাইয়াত ভঙ্গকারীর স্ত্রী তালাক হয়ে যেত এবং দাস-দাসী থাকলে তারা মুক্ত হয়ে যেতো। মোটের উপর তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে এক মহা ক্ষতির মধ্যে আপতিত হতেন। সর্বোপরি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কোন নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তির কাছ থেকে এ ধরণের বাইয়াত গ্রহণকে ক্ষমতা দখলকারীরা এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুমোদন হিসাবে বিবেচনা করতো। এ কারণেই ক্ষমতাসীনদের কাছে বাইয়াতের ব্যাপারটি অপরিহার্য হিসাবে গণ্য হতো।

আমীরুল মোমেনীন হযরত হোসাইন (রাদ্বিঃ)কে এই কারণেই ক্ষমতা জবর দখলকারী ইয়াজীদ বাইয়াত করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। হযরত হোসাইন (রাদ্বিঃ) এমন এক পরিস্থিতির শিকার হন যার বিরোধীর আয়ত্বাধীন রয়েছে তথাকথিত 'আদর্শ', 'ধর্ম', 'কুরআন', 'সম্পদ', তরবারী'। প্রচার মাধ্যম 'জনতা' এবং নবী (দঃ) এর মিথ্যা উত্তরাধিকার।

হযরত ইমাম হোসাইন (রাদ্বিঃ) রসূল (দঃ) এর একমাত্র জাহেরী ও বাতেনী ক্ষমতার প্রতিনিধি ও বেহেশতের বর্ণনকারী পিতা, বেহেশতের সম্রাজ্ঞী মাতার পুত্র। নিজে বেহেশতের সর্দার, জীবন্ত কুরআন, ও সাক্ষাৎ লা'ইলাহার ইল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূল্লাহ এর প্রতিচ্ছবি। তিনি কেমন করে

অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীর পুত্র, অবৈধভাবে বল প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়োজিত রাষ্ট্র প্রধান, ইসলামে প্রকাশ্য দুশমনকে কিভাবে কোন যুক্তিতে ইয়াজীদের মত দুশ্চরিত্র, পানাসক্ত, ধর্মহীন, ফাসেক ব্যক্তির রাজত্ব মেনে নিতে পারেন?

হযরত ইমাম হোসাইন (রাদ্বিঃ) এর নিকট বাইয়াত তলব:

হযরত ইমাম হোসাইন (রাদ্বিঃ) মদীনার গর্ভনর ওয়ালীদের আহ্বানে তাঁর দরবারে উপস্থিত হলেন। মদীনার গভর্নর বল্লেন, ইয়াজীদ আপনার বাইয়াত তলব করেছেন। হযরত ইমাম (রাদ্বিঃ) বল্লেন, ইসলামের খলীফা হওয়ার জন্য ইয়াজীদ সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ও অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী। তাই তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ইতোমধ্যে ইয়াজীদ ইমাম হোসাইনকে গুপ্তভাবে হত্যা করার জন্য ঘাতক নিয়োগ করে মদীনায় প্রেরণ করে। তাই হোসেন (রাদ্বিঃ) মদীনা ত্যাগ করে মক্কায় চলে যান। গুপ্ত ঘাতক সেখানেও তাঁকে অনুসরণ করে। মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে কুফাবাসীর নিকট থেকে তিনি ব্যপকভাবে চিঠি পেতে থাকেন। এসব চিঠিতে সবাই তাঁকে মাবিয়ার সাথে হযরত হাসান (রাদ্বিঃ) চুক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে তাকে বৈধ আমীরুল মোমেনীন হিসাবে বরণ করে নেয়। অনেকে এও লেখেন যে, হে মহান নেতা, আপনি যদি আমাদের কাছে না আসেন, আমাদেরকে বাধ্য হয়ে ইয়াজীদের হাতে বাইয়াত হতে হবে। কারণ ইয়াজীদের সরকারের মোকাবিলা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাল কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ্‌তা'লা যখন জিজ্ঞেস করবেন কেন আমরা ফাসেক ও অনুপযুক্ত ইয়াজীদের হাতে বাইয়াত গ্রহন করেছি, তখন আমরা বলব, হে আমাদের প্রভু, আমরা নবী (দঃ)'র দৌহিত্রের কাছে পত্র দিয়েছিলাম, সংবাদ পাঠিয়েছিলাম জান-মাল কোরবানী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম কিন্তু তিনি তশরীফ আনেন নি আমাদের দাওয়াত গ্রহণ করেন নি তাই আমরা বাধ্য হয়ে ইয়াজীদের হাতে বাইয়াত করেছি। তাই এ ব্যাপারে সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব আপনার উপরই বর্তাবে।" এ প্রেক্ষিতে হযরত হোসাইন (রাদ্বিঃ) প্রকৃত অবস্থা যাচাই এর জন্য এবং হযরত মুসলিমকে তাঁর পক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করার জন্য কুফায় প্রেরণ করেন। কুফায় পোঁছে আমন্ত্রনকারীদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হামী ইবনে উরওয়ার বাড়ীতে তিনি অবস্থান করলেন। তার আগমনে কুফায় সাড়া পড়ে গেল। এবং প্রতিদিন হাজার হাজার লোক ইমামের পক্ষে মুসলিমের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। অল্প দিনের মধ্যে প্রায় ৪০ হাজার লোক বাইয়াত গ্রহণ করে। মুসলিম ইমাম হোসেনকে পত্রের মাধ্যমে বিষয়টি অবহিত করেন। এবং বিষয়টি জানতে পেরে ইমাম হোসেন মক্কা থেকে কুফার পথে রওয়ানা হয়ে যান। ইতোমধ্যে ইয়াজীদ এ খবর জানতে পেরে কুফার তৎকালীন গভর্নর নোমান বিন বশীরকে পদচ্যুত করে আবু সুফিয়ানের অবৈধপুত্র যীয়াদের পুত্র উবাইদুল্লাহকে নিজ দায়িত্ব (বসরার গভর্নর পদসহ) কুফার গর্ভনর হিসাবে নিয়োগ প্রদান করে। এই উবাইদুল্লাহ বিন যীয়াদ কুফায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে এবং এক পর্যায়ে হযরত মুসলিমকে হত্যা করে এবং আহলে বাইয়াতদের অনুসারীদের খতম ও নিরস্ত্র করলো।

কারবালার ঘটনা:

হযরত ইমাম হোসাইন (রাদ্বিঃ)'র পরিবার ও সাথীদেরকে সঙ্গে নিয়ে কুফার দিকে কিছু দূর অগ্রসর হতেই উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের এক সামরিক কর্মকর্তা হোর ইবনে ইয়াজীদ এক হাজার সৈন্যসহ উপস্থিত হয়। তার প্রতি নির্দেশ ছিল যে, সে হযরত ইমাম হোসাইন এর কাফেলা অনুসরণ করবে এবং তাকে ঘিরে থাকবে (উৎপড়ৎং করে থাকবে) ইমাম হোসেন এই

সেনাবাহিনীর কাছে একাধিকবার তাঁর মর্যাদা, অবস্থান ও ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। হযরত হোসাইন (রাদ্বিঃ) সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলে হোর বাধা দেয়। ইতোমধ্যে কুফা হতে ইবনে যীয়াদের এক প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে সে যীয়াদের পত্র হোরকে হস্তান্তর করে। এই পত্রে নির্দেশ ছিল যে, হোসেন (রাদ্বিঃ)কে যেন কোথায়ও আশ্রয় নেবার সুযোগ না দেওয়া হয়। তাঁর জন্য খোলা মেলা প্রান্তর ছাড়া কোথায়ও তাবু ফেলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। হোর উবাইদুল্লাহর এই নির্দেশনা ইমাম হোসাইন (রাদ্বিঃ)কে অবহিত করে। এবং বলে যে আমি নিরুপায় আমি আপনাকে বৃক্ষলতা ও পানিশুন্য প্রান্তর ছাড়া অন্য কোথায়ও তাবু ফেলবার সুযোগ দিতে অপারগ। অতঃপর হোসাইন (রাদ্বিঃ) আকর নামক গ্রামে শিবির স্থাপন করার অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, আকর অর্থ কাটা, ব্যর্থতা, নিস্ফল। অতএব সেখানে শিবির স্থাপন করা সমীচীন নয়। অতঃপর তিনি আরও অগ্রসর হয়ে এক নিদারুন প্রান্তরে উপস্থিত হলেন। এই স্থানের নাম জানতে চাইলে তাকে বলা হলো যে এটির নাম কারবালা। তখন তিনি বললেন, "ইহা কারব এবং বালা অর্থাৎ কষ্ট ও বিপদ। এই স্থান ফোরাত নদী হতে দূরে এবং একটি পাহাড়ের ব্যবধানে ছিল। বর্তমান ইরাকের রাজধানী বাগদাদ হতে এই স্থানের দূরত্ব ৪০ মাইল। এই ঘটনা ৬১ হিজরীর ২রা মহররম তারিখে অর্থাৎ ৬৮০ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর সংঘটিত হয়। পরদিন হোরের বাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় পানিহীন কারবালা প্রান্তরে সঙ্গী ও পরিবারবর্গসহ হযরত ইমাম হোসনে তাবু ফেলে রইলেন। ওমর ইবনে সাদ (কারবালার যুদ্ধের কমান্ডার ইন চীফ) আরও চার হাজার সৈন্যসহ উপস্থিত হলো। হযরত ইমাম হোসাইন (রাদ্বিঃ) এর সাথে ওমরের আলোচনা চলাকালীন সময়ে উবায়দুল্লাহ এর নির্দেশনামা ওমর বিন সা'দ এর নিকট পোঁছানো হলো। নির্দেশনামা উল্লেখ করা ছিল-" হোসাইন (রাদ্বিঃ)কে বলো, প্রথমে তিনি তাহার সকল সাথীসহ ইয়াজীদ ইবনে মাবিয়ার প্রতি আনুগত্যের শপথ করুন। আর হোসাইন (রাদ্বিঃ) এর সাহাবীদের জন্য পানি সরবরাহ বন্ধ করে দাও। এক ফোঁটা পানিও যেন তাঁরা পান না করতে পারে। যেমন ওসমান (রাদ্বিঃ)কে পানি হতে বঞ্চিত করা হয়েছিল। স্মরণযোগ্য যে বিদ্রোহীগণ কর্তৃক ওসমান (রাদ্বিঃ)'র বাড়ী অবরোধ করা হলো স্বয়ং ইমাম হাসান ও হোসাইন (রাদ্বিঃ) আহত হওয়া সত্ত্বেও ওসমান (রাদ্বিঃ) এর জন্য খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করেছিলেন।

১০ই মুহাররম শুক্রবার। ওমর ইবনে সা'দ প্রভাতেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করল। এদিকে হোসাইন (রাদ্বিঃ) পরিবারের সদস্যদের সান্তনা দিয়ে বলেন, শিশুদের কান্না থামাও। কারণ শত্রুগণ আমাদের দুরবস্থা বুঝতে পারলে আরো উৎসাহিত হবে এবং আমাদের সৈন্যদের সাহস কমে যাবে। অতঃপর তিনি নিজ পক্ষীয় সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন এবং নিজে যুদ্ধসাজ পরিধান করলেন। মাথায় নবীজী (দঃ)'র পাগড়ী বাঁধলেন এবং গায়ে নবী (দঃ) এর ব্যবহৃত জামা পড়লেন, কোমরে পড়লেন ভাই হযরত ইমাম হাসান (রাদ্বিঃ)'র কটিবন্ধ এবং হাতে নিলেন শেরে খোদা আলীর (রাদ্বিঃ)'র বিশ্ব বিখ্যাত তলোয়ার- 'জুলফিকর' পৃষ্ঠদেশে ঢাল বাম হাতে বর্শা। অতঃপর তার প্রিয় ঘোড়া দুলজানায় সওয়ার হলেন। শরীরে উজ্জ্বল কান্তি, মাথায় সামান্য পাকা লম্বা চুল, মুখে ধুসর বর্ণের দাড়ি এবং চোখের তারায় গভীর মর্মভেদী দৃষ্টি সব মিলিয়ে আমীরুল মোমেনীনকে এমনই সৌম্যদর্শন ও মহীয়ান করে তুলেছিল সর্বোপরি রসূল (দঃ) এর সাথে তাঁর পবিত্র চেহারা মোবারকের সাদৃশ্য দেখে বক্ত ও অনুচরগণের প্রাণে এক অপূর্ব উম্মাদনার সৃষ্টি হলো। ক্ষনিকের তরে তারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, চিন্তা-ভাবনা সব ভুলে ঘন ঘন আল্লাহ্ আকবর ধ্বনিতে রণক্ষেত্র কাপিঁয়ে তুলল।

শত্রু বাহিনী নিকটবর্তী হলে হযরত হোসাইন (রাদ্বিঃ) তাঁর উষ্ট্রীতে আরোহন করলেন এবং কুরআন শরীফ সম্মুখে রেখে তাহাদিগকে সম্বোধন করে উচ্চ স্বরে 'এতমাউ হুজ্জুত' -অর্থাৎ নিজের দাবী বা নায়েবে রসূলগণ কর্তৃক তাদের বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য সঠিক যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করা। এই যুক্তি অগ্রাহ্য করা হলে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর উপর তার বান্দাদের এই দাবী করার অধিকার থাকে না যে, প্রকৃত সত্য সম্পর্কে তারা বেখবর ছিল। তাই এই যালেমদের জন্য প্রদেয় শাস্তি মাফের পক্ষে আর কোন যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ থাকে না। অর্থাৎ এই বক্তব্য শুনার, জানার ও বুঝবার পর ঐ ব্যক্তিবর্গকে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে, তারা আল্লাহর রসূল বা নায়েবে রসূলের কথা অনুযায়ী কাজ করবে কিনা। যে বা যারা তাঁর অনুসরণ করবে সে বা তাঁরা আল্লাহর নিকট প্রকৃত মোমিন হিসাবে বিবেচিত হবে অন্যথায় তারা কাফের হিসাবে গণ্য হয়ে কঠোর শাস্তির উপযোগী হবে। "দ্বীন ইসলামের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি বলতে লাগলেন, "তোমরা তাড়াহুড়া করিও না। প্রথমে আমার বক্তব্য শ্রবণ কর। আমার উপদেশ শুন। আমার কৈফিয়ত শুনিয়া লও। আমার আগমনের কারণ বলিতে দাও। যদি আমার কৈফিয়ত যুক্তি সঙ্গত হয় এবং তোমরা উহা গ্রহণ করিতে পার আর আমার প্রতি সুবিচার কর, তবে ইহা তোমাদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ হইবে এবং তোমরা অনর্থক আমার সহিত শত্রুতা হইতে বিরত থাকবে। তবে আমার বলিবার কিছু থাকবে না। তোমরা তোমাদের সকল সৈন্যসহ একযোগে আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িও। সর্বাবস্থায় আমার ভরসা একমাত্র আল্লাহরই উপর, কেননা তিনি সৎকর্মশীলদের সাথে সহায়ক। তোমাদের অন্তরের নিকট একবার গভীরভাবে প্রশ্ন করিয়া দেখ আমি কে? আমাকে হত্যা করা এবং আমার মর্যাদাকে পদদলিত করা তোমাদের পক্ষে জায়েজ কিনা?" অতঃপর তিনি তাঁর পিতা-মাতা মহান চাচার মর্যাদাও আল্লাহর কাছে প্রাপ্ত সম্মান, তাঁরা যে কুরআনে বর্ণিত আহলে বায়াত ও তিনি ও তাঁর ভাই হাসান বেহেশতের যুবকদের সর্দার। এমন ব্যক্তি হত্যা করা উচিত কিনা তা উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, তার অপরাধ কি? কোন অপরাধে তাঁকে এই সৈন্যরা হত্যা করতে চায়। বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, আছে কে এমন সহায় যে, আমাদিগকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাহায্য করবে, আছে কি এরূপ রক্ষক, যে রসূল্লাহর (দঃ) পূণ্যবর্তী কুলনারীদেরকে রক্ষা করিবে? হযরত হোসাইন (রাদ্বিঃ) এর বক্তব্যে ইয়াজীদ পক্ষের সামরিক কর্মকর্তা হোর যিনি হোসেনকে এতদিন পাহারা দিচ্ছিলেন ওমর বিন সা'দকে বলিলেন, আপনি কি সত্যিই হোসাইন (রাদ্বিঃ) এর সাথে যুদ্ধ করবেন। ওমর বলে যে হ্যাঁ সত্যিই যুদ্ধ ভয়াবহ যুদ্ধ। হোর বলিলেন, তিনি যে, তিনটি শর্ত দিয়েছিলেন উহার একটিও কি গ্রহণযোগ্য হইল না- ১) এজিদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ ২) মদীনায় ফিরিয়া যাওয়ার সুযোগ ৩) আরব ভুখন্ড থেকে চলে যাওয়ার সুযোগ। ওমর বল্লেন, "তোমাদের শাসনকর্তা উহা মঞ্জুর করলেন না। তাই বর্তমানে আমার কিছু করণীয় নাই। হোরের একজন স্বগোত্র মোহাজের তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তার সিদ্ধান্ত কি? হোর খুব গাম্ভীর্যের সাথে বললেন, আমি বেহেশত ও দোজখের কোনটি গ্রহণ করব। এই চিন্তাই করছিলাম। খোদার কসম দুইটির মধ্যে বেহেশত বেঁচে নিলাম। আমাকে যদি খন্ড বিখন্ড করিয়াও ফেলা হয় তবুও আমার কোন দুঃখ নাই। হোর ইহা বলেই দ্রুত বেগে অশ্ব চালাইয়া হোসাইন (রাদ্বিঃ) এর সৈন্য বাহিনীর সহিত মিশিয়া গেলেন।

ইমাম হোসাইনের (রাদিঃ) নিকট গিয়ে হোর বলিলেন, হে রসূল (দঃ)'র সন্তান। আমিই সেই নরাধম যে আপনাকে মদীনায় ফিরে যাইতে বাধা দিয়াছি এবং সারা পথ আপনার পাশ্চাতে থাকিয়া এই কারবালায় অবতরণ করিতে বাধ্য করিয়াছি। আল্লাহর শপথ! আমি এ কথা

কখনও বিশ্বাস করিতে পারি নাই যে, আপনার শর্তগুলির কোন একটিও মঞ্জুর হইবে না এবং ব্যাপার এতদূর গড়াইবে। উবাইদুল্লাহ ইবনে যীয়াদ আপনার সহিত এরূপ ব্যবহার করিবে ইহা আমি পূর্বে জানিতে পারলে কখনই আপনাকে এমন বিপদের মুখে টানিয়া আনিতাম না। হে রসূল (দঃ) এর সন্তান। আমি নিজকৃত অপরাধের জন্য অনুতাপ করার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। আমি আর ইয়াজীদের সৈন্যপক্ষে ফিরিয়া যাইব না। আমি আপনার পদতলে কোরবান হইব। ইহাতে কি আমার অপরাধ মাফ হইবে। (ঈমানদার ঠিকই জানেন কে কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী রসূল (দঃ) এর আহলে বায়াতগণই আল্লাহর নিকট একমাত্র সুপারিশকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিবেচিত) হযরত হোসাইন স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, আল্লাহ্ তোমার গুণাহ মাফ করিয়া দিবেন। তোমার নাম কি? তিনি বলিলেন ইয়াজীদের পুত্র হোর। হযরত হোসাইন (রাদ্বিঃ) বলিলেন, তুমি হোর বটে, হোর অর্থ মুক্ত তোমার মা যেমন নাম রাখিয়াছেন খোদা চাহেন তো তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্ত।" বেহেশতের সর্দার। হোরকে বেহেশতের সনদ দিলেন। হোর এবার ইয়াজীদ বাহিনীর সম্মুখে যাইয়া বলিলেন, হযরত হোসাইন (রাদ্বিঃ) যে তিনটি শর্ত পেশ করিয়াছেন। উহার যে কোন একটি মানিয়া লও। যেন আল্লাহ্‌তা'লা এই মহা পরীক্ষার হাত হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করেন। অতঃপর তিনি কুফাবাসীদের বিশ্বাস ঘাতকতার বিস্তারিত বিবরণ করিয়া উপস্থিত সকলকে হোসাইন (রাদ্বিঃ) এর বিরোধিতা না করার পরামর্শ দিলেন। ইহার প্রত্যুত্তরে শত্রুপক্ষ হইতে তীর বর্ষন শুরু হলো।

শুরু হলো কারবালার মহাযুদ্ধ। যুদ্ধের প্রথমদিকে প্রত্যেক পক্ষ হতে একজন বা দুইজন করে সৈন্য অবতীর্ণ হয়ে সামনা সামনি যুদ্ধ চলাকালীন সময় হযরত হোসাইন (রাদ্বিঃ)'র বাহিনীর সম্মুখে বিপক্ষীয় যে আসিল সে আর ফিরিল না। এই রীতিতে যুদ্ধ করে বিফল হয়ে ওমর বিন সা'দ ব্যপক আক্রমনের নির্দেশ দিল "ইমাম বাহিনীর বাম বাহু ভীষনভাবে প্রতিরোধ করতে লাগলেন মাত্র ৩২ জন অশ্বারোহী ছিলেন। তাঁরা যেদিকে আক্রমন করতেন সেদিকে সবকিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতেন। শত্রুগণ দেখিল এভাবে যুদ্ধ জয় করা অসম্ভব। সুতরাং শত্রুপক্ষের ব্যপক আক্রমন শুরু হলে তাদের সব অশ্বসমূহ অকেজো হয়ে পড়লে তাঁরা পদাতিক বাহিনীতে পরিনত হলেন।

হোর বিন ইয়াজীদ ইমাম (রাদ্বিঃ)' পক্ষে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ইয়াজীদ বাহিনী জয়ের কোন লক্ষনই দেখতে পেল না। শেষ পর্যন্ত ওমর বিন সা'দ আহলে বায়াতদের শিবিরে আগুন দেয়ার নির্দেশ দিল।

সেদিন ছিল শুক্রবার। জুময়ার নামাজ তো দূরের কথা যোহরের সময় হলেও শত্রুগণের আক্রমণ বন্ধ হলো না তারা বন্য পশুর ন্যায় হিংস্র হয়ে উঠেছিল। আহলে বায়াতগণ যুদ্ধরত অবস্থায় অগ্রপশ্চাত হয়ে একে একে 'কসর' (সংক্ষিপ্ত) নামাজ আদায় করলেন। নামাজের পর দেখা গেল ইমাম পক্ষে সৈন্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শুধু ইমামের কয়েকজন ভাই ও কয়েকজন বিশিষ্ট খাদেম এবং ইমাম পরিবারের সন্তানগণ অবশিষ্ট আছেন। ইমামের সাহায্যকারীরা যতক্ষন জীবিত ছিলেন ততক্ষন ইমাম বংশের কাউকে যুদ্ধ করতে দেননি। এরপর ইমামের পুত্ররা হায়দারী হাঁক দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে এলেন ও শাহাদত বরণ করলেন। শহীদ হলেন হাসান (রাদ্বিঃ)'র পুত্র কাসিম। ইমামের শিশু পুত্র পিপাসায় কাতর অবস্থায় পত্নী শাহারবানু তাঁকে দিলেন ইমামের কোলে। ইমাম দুশমনদের কাছে শিশুর জন্য এক ফোঁটা পানি চেয়েও পেলেন না। বরং শত্রু পক্ষের তীর তার শুষ্ক কন্ঠে বিদ্ধ হয়ে তাঁর পানির পিপাসা চিরতরে মিটিয়ে দিল।

হযরত আব্বাস তাঁর তিন সহোদর আব্দুল্লাহ, জাফর ও ওসমানকে যুদ্ধে পাঠালেন তারাও শহীদ হলেন। পিতার ইশারা পাওয়া মাত্র হযরত আব্বাসের ৮ / ১০ বৎসরের পুত্র মোহাম্মদ শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন। বাকী রইলেন ইমাম হোসাইন (রাদ্বিঃ) ও তার ভাই আব্বাস। এহেন পরিস্থিতিতে হযরত আব্বাস পানি আনার অনুমতি চাইলেন। ইমাম পাক বল্লেন, "যাও ভাই আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রিয় হাবীব তোমার সহায়।" এক হাতে বর্শা অন্য হাতে মশক নিয়ে ফোরাতের দিকে রওয়না করলেন। আঁকা (ভাই হলেও তিনি হযরত ইমাম রাদ্বিঃ কে আঁকা বা প্রভু হিসাবে সম্বোধন করতেন) নির্দেশে তিনি পানি আনতে রওয়ানা হলেন। হযরত আলীর বীর পুত্র যুদ্ধ করে ফোরাত শত্রু মুক্ত করে পানি নিয়ে ফিরাছিলেন। কিন্তু ঘাপটি মারা শত্রু অন্যায় যুদ্ধে পিছন থেকে আক্রমন করে তাঁর হাত কেটে ফেলে এবং তিনি শাহাদত বরণ করেন।

হযরত হোসাইন (রাদ্বিঃ) শাহাদত:

আব্দুল্লাহ ইবনে আম্মার এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন হযরত ইমাম হোসাইন এর যুদ্ধ সম্পর্কে তার বর্ণনা: আমি বর্শা দ্বারা হযরত হোসাইন (রাদ্বিঃ)কে আক্রমন করিয়াছিলাম এবং একেবারে তাহার কাছে পৌঁছিয়াছিলাম। ভালবাসা সব দিক দিয়াই তিনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যেদিকে ফিরিতেন সেদিকেই শত্রু সৈন্যদেরকে বিতাড়িত করিয়া লইয়া যাইতেন। দেহে জামা, মাথায় পাগড়ী বাঁধা অবস্থায় তিনি লড়িতেছিলেন। খোদার নামে বলিতেছি, এরূপ ভগ্ন হৃদয় ব্যক্তি যাহার পরিবারের সকলেই একের পর এক চোখের সামনে শত্রুর হাতে নিহত হইয়াছে; সেই মানুষের মধ্যে এরূপ বীরত্ব, সাহস, দৃঢ়চিত্ততা এবং স্থিরতা আমি জীবনে আর কখনও দিখি নাই।

তিনি ডানে বামে যে দিকে ফিরিতেন সেই দিকেই শত্রুদল ব্যাঘ্র তাড়িত ভীরু মেষপালের ন্যায় উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিত। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই অবস্থা চলিল। তখন ওমর ইবনে সা'দ আসরের নামাজ কাজা হয়ে যাবে (নামাজের মধ্যে যাদের জন্য দোয়া করা হয় তাদেরকে হত্যা করার জন্য) তাই সহসাই যুদ্ধ শেষ করার নির্দেশ দেয়। এই লক্ষ্যে আক্রমন জোরদার করার নির্দেশ দিল। তাই সবাই একযোগে ইমাম পাককে আক্রমন করল। কোন তীর ঘোড়ার পায়ে লাগছিল। কোনটা তাঁর নিজের পবিত্র শরীর মোবারকে লাগছিল। এভাবে যখন তীরের আঘাতে তাঁর পবিত্র শরীর ঝাঝরা হয়ে ফিনকি দিয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত বের হতে লাগলো। তখন ইমাম পাক বার বার মুখে হাত দিয়ে বল্লেন, 'বদবখত', তোমরা তোমাদের নবী (দঃ) এর লেহাজ করলে না, তোমরা নবী (সাঃ) এর আহলে বায়াতকে হত্যা করলে।" মহান ইমাম ঘোড়া থেকে পতিত হলেন। যাকে নবী (সাঃ) নিজের কাঁধে রাখতেন। ঘোড়া থেকে পতিত হওয়ায় সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী সীমার হাওলা বিন ইয়াজীদ, সেনান বিন আনাস প্রমুখ জালিম এ গিয়ে আসল। সীমার হযরত হোসাইন (রাদ্বিঃ) এর বুকের উপর বসল। তাকে দেখে হোসাইন বল্লেন, আমার নানাজান (রসূল দঃ) ঠিকই বলেছেন এক হিংস্র কুকুর আমার আহলে বায়াতের রক্তের উপর মুখ দিচ্ছে। ইমাম পাক সিজদায় মাথা রাখলেন তাসবীহ সুবহানা রাব্বিল আলা পাঠ করে বল্লেন, **"মওলা, যদি (হোসাইন রাদ্বিঃ) এর কুরবানী তোমার দরবারে গৃহীত হয় তাহলে এর সওয়াব নানাজান (দঃ) এর উম্মতের উপর বকশিশ করে দাও।"** (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাহি রাজিউন) ইমাম পাকের মস্তক মোবারক বিচ্ছিন্ন করা হলে তাঁর ঘোড়া দুলজানা স্বীয় কপালকে তাঁর পবিত্র রক্তে রঞ্জিত করে এবং দৌঁড়তে থাকে। তখন সীমার বলতে

লাগল, ঘোড়াটিকে ধর। যতজন ঘোড়াটিকে ধরতে এগিয়ে এলো সে সবাইকে আক্রমন করলো। এভাবে সতেরজন খোদার দুশমন খতম হয়ে গেল। তারপর ঘোড়া দৌড়ে গিয়ে তাবুর কাছে গেল এবং কান্না জুড়ে দিল।

জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী বলেছেন, নিহত হওয়ার পর হযরত ইমাম পাকের পবিত্র দেহে ৩৩টি বর্শার আঘাত ৩৪টি তরবারির আঘাত দেখা যায়।

ওমর বিন সা'দের প্রতি যীয়াদের নির্দেশ ছিল। ইমাম (রাদ্বিঃ) এর লাশ মোবারক যেন পদদলিত করা হয়। এবার সেই কাজের পালা। ওমর বলল, হোসাইন (রাদ্বিঃ) এর দেহ অশ্বখুরে দলিত করার জন্য কাহারা তৈয়ার আছ? অমনি ১০ জন সিপাহী প্রস্তুত হলো এবং ইমাম (রাদ্বিঃ) এর পবিত্র দেহ মোবারকের উঁপর দিয়া ঐ দশজন সিপাহী ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেল। কারবালার মহা রণ শেষ হলো।

কারবালার ঘটনা দুঃখদায়ক ও লোম হর্ষক। পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধরনের জঘণ্যতম কোন ঘটনা ঘটেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এটি এমন একটি বেদনাদায়ক ঘটনা যার চেয়ে লজ্জাজনক আর কোন ঘটনা ইলসামে ঘটেনি। আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক সেই সব লোকের প্রত্যেকের উঁপর যাদের হাত ছিল সেই ঘটনায় অর্থাৎ যারা হুকুম চালিয়েছে এবং যারা এই কাজ সম্পাদনে কোন না কোনভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

হযরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী বলেছেন, "হোসাইন ছিলেন বাদশাহ। তিনি ছিলেন বাদশাহদের বাদশাহ। তিনি ছিলেন স্বয়ং ইসলাম ধর্ম, তিনি ছিলেন ইসলাম ধর্মের সাহায্যকারী। তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন কিন্তু (মিথ্যার কাছে) আত্মসমর্পন করেননি।

প্রকৃতপক্ষে হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের দ্বীন ইসলামেরই মৃত্যু সংঘটিত হয়েছিল আর আহলে বায়াতের মহান ওলী হযরত গাউসুল আযম আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) মহিউদ্দিন নাম ধারণ করে এই দ্বীনকে পুনর্জীবন দান করেছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে আহলে বায়াতের প্রকৃত অনুসারী হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন!

তথ্যসূত্র:

১। আহলে বায়াতই ইমানের ভিত্তি লেখক ফারুক চৌধুরী (ïïï. ঃযবঃৎঁনফ.পড়স)

২। ইমাম হাসান ও খেলাফত লেখক মোস্তফা (ইতিহাসের অব্যক্ত অধ্যায়)

৩। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিদায় হজ্বের শেষ ভাষণ মূল: আল্লামা আবু মনসুর আহমদ ইবনে আলী

আত-তাবারসী (রহঃ)।

ভাষান্তর: ইরশাদ আহমদ।

৪। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ও অন্যান্য কল্পকাহিনী লেখক আল্লামা সাইয়েদ মুবতাযা আসকারী অনুবাদ নূর হোসেন মজিদী।